সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু* : একটি বিকল্প পাঠ

মো. সোহানুজ্জামান*

[সারসংক্ষেপ : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু* উপন্যাসের বিষয় হিসেবে প্রচলিত সাহিত্য-সমালোচনায় পূর্ব-বাংলার পির সংস্কৃতিকেই প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আলোচনা-সমালোচনা করা হয়। একইসাথে ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস আলোচনায় বিষয়ের চেয়ে সাহিত্য-প্রকরণকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। *লালসালু* উপন্যাস সম্পর্কে 'প্রচলিত সাহিত্য-সমালোচনার' বিপরীতে এই প্রবন্ধে 'বিকল্প পাঠ' উপস্থাপিত হবে। 'বিকল্প পাঠ' বলতে অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, নৃতত্ত্ব, ধর্ম, শিক্ষাসহ সমাজ-সম্পর্কিত আরও নানান বিষয়ে সম্পৃক্ত হয়ে উপন্যাস-পাঠকে বোঝানো হচ্ছে : যে সমস্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে এই উপন্যাস নির্মিত হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা-প্রবন্ধে দেখানো হবে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত এবং পরিপ্রেক্ষিত-প্রভাবে কীভাবে এই উপন্যাস বৈষয়িক দিক থেকে সম্পূর্ণ হয়েছে। এক্ষেত্রে এই উপন্যাসের সাহিত্য-প্রকরণও (Literary Technique) আলোচিত হবে।]

'৪৭ সালের দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে 'পূর্ব-বাংলার' উপন্যাস-ইতিহাস-বিবেচনায় এবং আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের বিবেচনায়ও নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ (১৯২২-১৯৭১)। বিশেষ করে সাহিত্যে নন্দনতত্ত্বের (Aesthetics) বিচারে ওয়ালীউল্লাহ্‌কে বারংবার পাঠ ও বিবেচনা করা হয় 'আধুনিক' হিসেবে। 'আধুনিক' সাহিত্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত অবশ্যই পালিত হয়েছে ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে; সেটা অনেকাংশেই সক্রিয় থেকেছে তাঁর উপন্যাসের প্রকরণ-কৌশলে, উপন্যাসের বিষয়ে নয়। উপন্যাসের বিষয়-নির্বাচনের বেলায় ওয়ালীউল্লাহ্‌ সর্বদাই সজাগ থেকেছেন; বিশেষভাবে উপন্যাসের বিষয় নির্বাচনে সম্পৃক্ত থেকেছেন পূর্ব-বাংলার ভূমি, মানুষ ও মানুষের ক্রিয়াকলাপের সাথে। বিশেষ করে কলকাতাকে কেন্দ্র ধরে যদি এই আলোচনা করা হয়– তবে এই বিষয় আরও স্পষ্ট হবে।

'আধুনিক' সাহিত্যে নগর, 'নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত', (দীপ্তি, ১৯৯৭ : ২) নগরের মানুষ এবং এই নাগরিক মানুষের নানারকম কর্মপ্রবাহ সক্রিয় থাকে; এবং সেই বিষয় নির্ধারিত হয় 'আধুনিক' সাহিত্যের বিষয় হিসেবে– এই ব্যাপারটা অনেকাংশেই বাতিল হয়ে যায় ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে। পূর্বোক্ত ব্যাপারটা বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, প্রকরণের ক্ষেত্রে ভিন্নতার দাবিদার। অর্থাৎ 'আধুনিক' সাহিত্যের প্রকরণ-কৌশল ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে সক্রিয়তা হারায় না। প্রকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওয়ালীউল্লাহ্‌ বারংবার পাশ্চাত্যের নানারকম 'সাহিত্য-প্রকরণ' ধার করে তা তাঁর সাহিত্যে ব্যবহার করলেও বিষয়ের বেলায় ব্যাপারটা একেবারেই ভিন্ন।

ওয়ালীউল্লাহ্‌ সব মিলিয়ে, বাংলা ভাষায়, মাত্র তিনটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। ইংরেজিতে লিখেছিলেন আরও দুটো উপন্যাস। বলতে দ্বিধা নেই, সেই ইংরেজি উপন্যাসেও তিনি 'দেশি' বিষয় ব্যবহার করেছেন। তা পূর্ব-বাংলা [বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্র] না ছুঁয়ে গেলেও,

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

উপমহাদেশের [ভারতীয় উপমহাদেশ] বাইরে যেতে পারেনি। আর সেই 'না যাওয়া ব্যাপারও' বিশেষভাবে সম্পৃক্ত থেকেছে পূর্ব-বাংলার মাটি-মানুষ, তাদের আকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক সূত্রের সাথে। ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলায় যে তিনটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন তার মধ্যে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল *লালসালু* (১৯৪৮) উপন্যাস। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বিভক্তিতে প্রাপ্ত সদ্যোজাত ভূমিতে [পাকিস্তান] একেবারেই আনকোরা এক উপন্যাস; যা এই ভূমির [পূর্ব-বাংলা] আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়কে সাথে নিয়েই নির্মিত হলো। কিন্তু 'আধুনিকতা' 'প্রগতিশীলতা' আর 'পির সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের' কথাই প্রাধান্য পায় লালসালু উপন্যাস-পাঠের বেলায়। আদতেই কি 'আধুনিক' উপন্যাস : *লালসালু*? তাছাড়া কেবলই কি প্রচারিত হয়েছে পূর্ব-বাংলার পির-সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা আর বিরোধিতার বিষয়? আদতে এই দুটো বিষয় নয়, এই উপন্যাস ধারণ করে আছে আরও নানান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক চিহ্ন-সূত্র।

'আধুনিকতার' আর কলকাতাকেন্দ্রিক 'রেনেসাঁর' প্রতি তীব্র আকর্ষণ, তীব্র আগ্রহ পূর্ব-বাংলার মানুষের মানস-জগতে গভীরভাবে ক্রিয়াশীল থেকেছে দীর্ঘদিন; তা এখনো যে উন্মূলিত হয়েছে, তা হলফ বলা যাবে না। সেই 'আধুনিকতা' এবং 'রেনেসাঁ' যতই মেকি হিসেবে সমালোচিত হোক না কেন। 'রেনেসাঁ' এবং 'আধুনিকতায়' যে সমস্ত কার্যকলাপ সংঘটিত ও সম্পাদিত হয়েছিল সে সময়কার 'কেন্দ্র কলকাতায়', তা থেকে নানান কারণে দূরবর্তী অবস্থানে ছিল পূর্ব-বাংলা : তা অবস্থানগত দিক থেকে যেমন সত্য, তেমনি সত্য 'মানসিকতার দ্বন্দ্বে'র ক্ষেত্রেও।

এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য, 'ধর্মচৈতন্যে'র প্রভাব এবং 'পরাজিতের সাধারণ মানসিক অবস্থা'— এই দ্বৈত অবস্থার প্রভাবে পূর্ব-বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ 'নতুন উপনিবেশ' এবং এর কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেনি। এবং দূরত্ব যা বজায় রাখার দরকার, তা তারা রেখেছিল। ফলে আকাঙ্ক্ষিত 'আধুনিকতা'র ব্যাপারে তীব্র আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এই পরাজিত শ্রেণি কখনই মানসিকভাবে বিজেতার শাসনযন্ত্রের সাথে একত্রিত হতে পারেনি। এর পিছনেও নানান কারণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। (রফিকউল্লাহ, ২০০৯ : ৪-৫) নানা চিহ্ন-সূত্রের স্বয়ংসম্পূর্ণতায় এবং বাস্তব জীবনযাপনের নানা ক্রিয়াকলাপে 'প্রগতিশীল' ও 'অসাম্প্রদায়িক' ও 'আধুনিক' হিসেবে স্বীকৃত ওয়ালীউল্লাহ্ও কিন্তু এই একই কারণে স্বতন্ত্র ভূমির ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন; সক্রিয়তায় অংশগ্রহণ করেছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের মতো 'ইউটোপিয়ান'[১] কর্মকাণ্ডে। আসলে পূর্ব-বাংলার গড় জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবেই যেন ওয়ালীউল্লাহ্ও জানিয়ে দেন 'রেনেসাঁ' এবং 'আধুনিকতার' প্রতি পূর্ব-বাংলার মানুষের তীব্র আকাঙ্ক্ষার ব্যাপার। কিন্তু কেন এই আকাঙ্ক্ষা? তা স্পষ্ট হওয়া উচিৎ।

এই আকাঙ্ক্ষার পিছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কাজ করেছে দুই বাংলার 'সাংস্কৃতিক দূরত্ব' [শিক্ষা, শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত নানা প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য, শিল্প, সংগীতসহ এমন নানা বিষয়কে এক কথায় 'সাংস্কৃতিক দূরত্ব' হিসেবে উদ্ধৃত হচ্ছে]। যদিও অনেকে মনে করেন যে, অর্থনৈতিক অবলম্বনের স্থানচ্যুতি কিংবা স্থানান্তর [সামন্ততন্ত্র এবং লগ্নি পুঁজি— এই দুই দিক বিবেচনায়] হয়তো বিভাজনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু সেটা কেবল একদিক থেকে সত্য, সর্বাংশে সত্য নয়। ফলে 'সাংস্কৃতিক দূরত্বের' ব্যাপারটাও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব-বাংলার বৃহৎ একটা শ্রেণি যে এই শাসনযন্ত্রের [ঔপনিবেশিক] প্রতি আকাঙ্ক্ষিত হয়নি, এমনও নয়। কিন্তু সম্পৃক্ত হতে যাবে কী নিয়ে? হাতে টাকা থাকলেই তো সব হয় না। ভাষাও লাগে, লাগে চলাফেরার আদবতমিজ। তা তো পূর্ব-বাংলার গড় জনগণের

ছিল না, নির্দিষ্ট শ্রেণির লোকজনও প্রথম দিক থেকেই ইংরেজ-উপনিবেশ-বিরোধিতার কারণে এই বিষয়সমূহ আয়ত্ত করতে পারেনি। এর পিছনে মূল কারণ ছিল মূলত দুটি : ক. 'অতীত স্মৃতি' খ. পূর্বোক্ত 'পরাজিতের মনস্তত্ত্ব'।

বিশেষ করে টমাস বেবিংটন মেকলে (Thomas Babington Macaulay, 1800-1859) ১৮৩৫ সালে যখন রাজ-ভাষার এবং শিক্ষা-ব্যবস্থার রদবদল করলেন– তখন এই সমস্যা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ১৮৩৫ সালে টমাস বেবিংটন মেকলে ফারসির বদলে– বাংলা নয় অন্য কোনো ভারতীয় ভাষাও নয়– ভারতে 'ব্যবসায়ী ইংরেজ সরকারের'[২] সকল ব্যবস্থায় ইংরেজি ভাষা প্রতিস্থাপন করেন, প্রবর্তন করেন নতুন শিক্ষানীতি। এমনকি মেকলে এটাও বলেন যে, 'আমি কখনই তাঁদের মধ্যে [সেইসব ইংরেজ, যাঁরা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজির পরিবর্তে ভারতীয় ভাষার পক্ষে ওকালতি করছেন] এমন একজনকেও পাইনি, যিনি অস্বীকার করতে পারবেন যে একটা ভালো ইউরোপীয় লাইব্রেরির একটামাত্র শেলফ পুরো ভারতের নেটিভ ও আরবীয় সাহিত্যের সমতুল্য।' (Macaulay, 1835) ২রা ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ সালে 'মিনিট অন ইন্ডিয়ান এডুকেশন' (*Minute on Indian Education*) প্রবন্ধে মেকলে যখন একইসাথে এই বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও বর্ণবাদী বক্তব্য দিচ্ছেন; তখন পূর্ব-বাংলার, এমনকি সমগ্র ভারতের মুসলমানদের যে অংশটা তখনো ইংরেজ প্রশাসনের নানাস্থানে কর্মরত ছিল ফারসি ভাষার বদৌলতে– তারাও কেউ কেউ চাকরি খুইয়ে বসে, বসার উপক্রমের পথে উপনীত হয়। এই বেদনাবোধ আরও বাড়িয়ে তোলে সিপাহি বিদ্রোহের পরাজয়ের হতাশা আর গ্লানি।

'সাংস্কৃতিক' বোধ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চিন্তায় সক্রিয় বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। এমনকি এই বোধটা যে ওয়ালীউল্লাহ্‌কে প্রথম থেকেই তাড়িত করেছিল, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। কারণ মহৎ এবং বড়ো লেখকরা অভিক্রিয়া ও পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতি দ্বারা তাদের লেখাজোখা তৈরি করেন। ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাই করেছেন, কেবল ভিন্ন হয়েছেন সাহিত্য-প্রকরণে (Literary Technique)। প্রকরণের ফলেই তাঁর সাহিত্যিক বৈষয়িকতা চূর্ণনীয় হয়ে উঠেছে– আলোচিতও হয়েছে সবচেয়ে কম, সমালোচনায়। ফলে গুরুত্বপূর্ণ 'সাংস্কৃতিক' বিষয়– যা দেশভাগ এবং হিন্দু-মুসলমানের পরিচয়গত সংকটেরও (Identity Crisis) সৃষ্টি করেছে; এবং আলাদা হওয়ার রসদও জুগিয়েছে। এই সাম্প্রদায়িকতার মতো নিন্দনীয় সহিংসতায় পড়ে লোকজন বেঘোরে মারাও পড়েছে।

ফলে লাগামটা আর ধরি ধরি করেও ধরা হলো না পূর্ব-বাংলার গড় জনগণের। কিন্তু চেতনাবাধ তো আর চিরদিন একস্থানে স্থির থাকে না। মানুষ দেখে হলেও কিছু শেখে। সেই প্রক্রিয়ায় পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে তুলনায় গিয়ে পূর্ব-বাংলার জনগণ দেখলো আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থান-বিবেচনায় কেন্দ্রসহ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় তাদের অবস্থান সঙ্গিন। কিন্তু পূর্ব-বাংলার প্রাক-ঔপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা ছিল চমকপ্রদ; এবং কেন্দ্র দিল্লির সাথে মোকাবিলা করে স্বাধীনতা-ঘোষণার মতো তুরীয়বাদী সিদ্ধান্ত এই পূর্ব-বাংলায়ই সম্ভব হয়েছিল! কিন্তু তার বিনাশের ইতিহাস এবং রিক্ততা সম্পৃক্ত বর্তমান অবস্থা [দেশভাগ পূর্ববর্তী অবস্থা] ওয়ালীউল্লাহ্‌কে গভীরভাবে ভাবিয়েছে।

উপন্যাসের শুরুতেই ওয়ালীউল্লাহ্‌ এমন এক দেশের বর্ণনা করেন, যা ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত দিক থেকেও একটা চিহ্ন-সূত্রের জোগান দেয় "...দেশটা কেমন মরার দেশ।

শস্যশূন্য। শস্য যা-বা হয় তা জনবহুলতার তুলনায় যৎসামান্য। সেই হচ্ছে মুশকিল। এবং তাই খোদার পথে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসার চেতনায় যেমন একটা বিশিষ্ট ভাব ফুটে ওঠে, তেমনি না খেতে পেয়ে চোখে আবার কেমন-একটা ভাব জাগে।" (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১২ : ৪) আসলে এই উপন্যাসের শুরুর এই ক' বাক্যেই এক ধুন্ধুমার কাণ্ড যে ওয়ালীউল্লাহ্ ঘটিয়ে ফেলেছেন তা কি খেয়াল করা উচিৎ নয়? কেবলই 'আধুনিকতা' আর 'আধুনিক প্রকরণ' আর 'মজিদের ভণ্ডামিতেই' কি শেষ হয়ে যাবে এইরকম ভৌগোলিক ও সমাজনিষ্ঠ এক দলিল? তা হতে পারে না। সেই বিষয় নিয়েই আলোচনা করা উচিৎ। বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্র কলকাতার সাহিত্যের সাথে যে পূর্ব-বাংলার সাহিত্যের বিষয়গত পার্থক্য– তার কারণটাই ওয়ালীউল্লাহ্ জানিয়ে দেন উপন্যাসের সূচনায়। সেই সূচনা অংশে সমাজনিষ্ঠ এবং ভূমি-নির্ভর এক উপন্যাসের-পাঠের চোরা-সংকেত ওয়ালীউল্লাহ্ প্রথমেই জানিয়ে দেন। নগর কলকাতা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য নির্মিত হওয়ার বেলায় যে আবেগ-অনুভূতি সক্রিয় থাকে, তার সাথে একটা বড়ো পার্থক্য বজায় থেকেছে এই উপন্যাস রচনার বেলায়। এই বিষয়ে নিম্নোক্ত উক্তি নানান কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

> বাঙলার পূর্বাঞ্চলের প্রকৃতি ভিন্নধর্মী। পূর্ব-বাঙলার নিসর্গ হৃদয়কে ভাবুক করেছে বটে, কিন্তু উদাসী করেনি। দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরের অভাব সেখানেও নেই, কিন্তু সে প্রান্তরে রয়েছে অহোরাত্র জীবনের চঞ্চল লীলা। পদ্মা-যমুনা-মেঘনার অবিরাম স্রোতোধারায় নতুন জগতের সৃষ্টি ও পুরাতনের ধ্বংস। প্রকৃতির বিপুল শক্তি নিয়তই উদ্যত হয়ে রয়েছে, কখন আঘাত করবে তার ঠিকানা নেই। কূলে কূলে জল ভরে ওঠে, সোনার ধানে পৃথিবী ঐশ্বর্যময়ী, আর সেই জীবন ও মরণের আনন্দ দোলার মধ্যে সংগ্রামশীল মানুষ। প্রকৃতির সে ঔদার্য, সৃষ্টি এবং ধ্বংসের সেই সংহত শক্তি ভোলবার অবসর কই? চরের মানুষ নদীর সাথে লড়াই করে, জলের ঐশ্বর্যকে লুটে জীবনের উপাদান আনে। তাই লোকাতীতের মহত্ত্ব হৃদয়কে সেখানেও স্পর্শ করে, কিন্তু মনের দিগন্তকে প্রসারিত করেই তার পরিসমাপ্তি। প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণের সেখানে অবকাশ কই? (হুমায়ুন কবির, ২০১৫ : ২)

ভৌগোলিক ও আবহাওয়া-জলবায়ুগত নানা অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নানাবিধ বিষয়ের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল ওয়ালীউল্লাহ্র। দেশকে [পূর্ব-বাংলা] ভীষণভাবে ভালোবাসতেন। দেশের বাইরে অবস্থানকালে দেশ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন; দেশকে নিয়ে ভাবতেন। বিশেষ করে পূর্ব-বাংলার নিসর্গ-রূপ তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তা তিনি উপন্যাস রচনার বেলায়ও স্মরণে রেখেছেন। এ বিষয়ে আন মারির উক্তিও নানান কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

> দেশকে সে গভীর ভালোবাসত। পূর্ব বাংলার সৌন্দর্য, অজস্র আঁকাবাঁকা নদী, সবুজ খেত, তরুবীথির পেছনে ঢাকা পড়া ছোট ছোট গ্রাম, বাঁশঝাড়, কাঁঠালগাছ, দামাল মেঘ, দমকা বাতাসের সঙ্গে মৌসুমি বৃষ্টিতে বেরিয়ে পড়া শিশু-কিশোরের দল– আমাকে এসব দেখানোর জন্য সে উদ্গ্রীব ছিল।... নিজের দেশের দারিদ্র্য, পশ্চাৎপদতা, দেশটিতে ব্রিটিশ, হিন্দু জমিদার এবং এখন পাকিস্তানিদের [ষাটের দশক] শোষণকে ঘৃণা করত সে। (আন মারি, ২০১২ : ৩২)

মধ্যযুগে, মুসলিম শাসনামলে, কেন্দ্র [রাজধানী] হিসেবে ঢাকা যখন অবস্থান হারালো, ইংরেজদের ব্যবসিক তল্পিবাহক জব চার্নক (Job Charnock, 1630-1692/93)[৩] ঢাকা থেকে যখন তার তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে সুতানুটিতে ব্যাবসা আরম্ভ করলো– সমস্যার সূচনা সেখান থেকেই। পরবর্তী সময়ে তা ক্রমায়াতভাবে বেড়েছে। যে 'বাঁশবনে' চার্নক 'বাঁশবনের রাজা' হয়েছিলেন, সেখান থেকে দ্রুতই বেড়ে উঠতে থাকে কলকাতা নগর– এই নগরের নানা

প্রভাব-প্রতিপত্তি [প্রধানত অর্থনৈতিক] ছড়িয়ে পড়তে থাকে সমগ্র ভারতবর্ষে। (তীর্থংকর, ২০১৭ : ৫৯-৬৫) ১৭৫৭ সালের পলাশি যুদ্ধের মাধ্যমে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ে ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ব-বাংলা আরও বেশি নিষ্প্রাণ হতে থাকে। ১৭৫৭ পরবর্তী সময়ে বাংলা অঞ্চলের মৌন-অবস্থা সম্পর্কে উইলিয়াম উইলসন হান্টারও (William Wilson Hunter, 1840-1900) এই একই কথা বলেছেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *পল্লীবাংলার ইতিহাস* (*The Annals of Rural Bengal, 1868*) গ্রন্থে। (হান্টার, ২০১৮ : ২৭-২৮) এই নিশ্চলতা– অর্থনৈতিকভাবে তো বটেই– এরপর আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে। বিশেষভাবে বলতে গেলে, "রাজনীতিক পরিবর্তনে পুরনো অবস্থাসম্পন্ন মুসলমান পরিবারগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়।" (সরদার ফজলুল, ২০১৬ : ১৮)

অর্থাৎ বাংলার রাজধানীর ক্রমাগত পরিবর্তন পূর্ব-বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর গভীর প্রতিঘাত ফেলেছে। সেই প্রাচীন আমল থেকেই নানা কারণে পূর্ব-বাংলা অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদ্‌ভূমি (*Hinterland*) হিসেবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। ইংরেজ আমলে তা একেবারেই স্বীকৃত রূপ হিসেবে প্রাধান্য পায়। কারণ কেন্দ্র কলকাতার সাথে পূর্ব-বাংলার যে রেল-ব্যবস্থা নির্মিত হয়েছিল তার সাথে রয়েছে কেবলই ব্যবসায়ী-সম্পর্ক, তাছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু এসব কর্মকাণ্ডের ফলে আর্থিকভাবে যে এতটা পরিযায়ী অবস্থার মধ্যে পতিত হতে হবে পূর্ব-বাংলার মানুষকে– তা তারা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। ফলে ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু* উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মজিদের পরিযায়ী পরিস্থিতি [আর্থ-উৎপাদন-সম্পর্ক] এবং এর পিছনে মজিদের পিতৃভূমির বিরানতার রূপকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এক বাস্তবচিত্র। তা পূর্ব-বাংলার ক্রমাগত আর্থিকভাবে নিঃশেষ হওয়ারই চিত্র।

ফলে বিষয় হিসেবে ওয়ালীউল্লাহ্‌র পূর্ব-বাংলার মাটি-মানুষকে তাঁর উপন্যাসে ব্যবহার করারও সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। মনে রাখা জরুরি যে, যে 'আধুনিকতা' আর 'প্রগতির' স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌র মতো গভীর 'আধুনিক' চেতনাবোধ সম্পন্ন মানুষও এই কারণেই পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের ক্রমাগত নয়া-ঔপনিবেশিক কর্মকাণ্ড ওয়ালীউল্লাহ্‌কে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল, তিনি তাঁর অবস্থানও পালটে ফেলেছিলেন পরবর্তীকালে, দ্রুতই।

উপনিবেশ-প্রভাবিত নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি যে বিপুল অনীহা পূর্ব-বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা গিয়েছিল, তার খেসারত কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ দিতে হয়েছিল এ অঞ্চলের মানুষের। এখনো যে সক্রিয় রয়েছে এই ব্যাপারটা, তার মূল কারণও সে সময়ের পশ্চাদ্‌গামী চিন্তা। পূর্ব-বাংলার বড়ো একটা শ্রেণি অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান, সেই সময় ইংরেজ শিক্ষার প্রতি ছিল অনাগ্রহী। এর পিছনেও বিজিত ও পরাজিতের মানসিকতা সক্রিয় ছিল, আর ছিল অতীত-সম্পৃক্ত ধর্মীয় গোঁড়ামি। বিশেষ করে কেন্দ্র কলকাতা থেকে পূর্ব-বাংলার সাংস্কৃতিক দূরত্বের কারণের মধ্যে ছিল শিক্ষা-বিষয়ে ভীষণ অনাগ্রহ। আর ধর্ম-চৈতন্যের গভীর প্রভাব তো এক্ষেত্রে কার্যকর ছিলই; যা পাশ্চাত্য শিক্ষা-গ্রহণে ছিল প্রধানতম অন্তরায়। এই চিত্র ওয়ালীউল্লাহ্‌ *লালসালু* উপন্যাসে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক 'মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাসে'র মাধ্যমে দেখিয়েছেন।

> হাওয়ায় ক-দিন ধরে একটা কথা ভাসে। মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস নাকি গ্রামে একটি ইস্কুল বসাবে। আক্কাস বিদেশে ছিল বহুদিন। তা আগে করিমগঞ্জের স্কুলে নিজে নাকি পড়াশোনা করেছে কিছু।...
>
> ...কোত্থেকে শিখে এসেছে ইস্কুলে না পড়লে নাকি মুসলমানদের পরিত্রাণ নেই। হ্যাঁ, মুরব্বিরা স্বীকার করে, শিক্ষা ব্যাপারটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু গ্রামে কি দু-দুটো মক্তব বসানো হয় নি? সে কি বলতে পারবে এ-কথা যে, গ্রামবাসীদের শিক্ষার কোনোখান দিয়ে কিছুমাত্র অবহেলা হচ্ছে? (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১২ : ৪৫)

ফলে এই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবনের মানোন্নয়ন বা অগ্রগতির কোনো চিহ্নই চোখে পড়ে না। কিন্তু শিক্ষা গ্রহণে যে একেবারেই মুসলিমদের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না এমনটা বললে ভুল হবে। কারণ নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থায় অনেক পরে হলেও মুসলমানদের অংশগ্রহণের ফল হিসেবে মুসলিম চাকুরের উপস্থিতি ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর উপন্যাসে দেখিয়েছেন। ওয়ালীউল্লাহ্ বলছেন, *লালসালু* উপন্যাসে, "এক সরকারি কর্মচারী সেখানে হয়তো একদিন পায়ে বুট এঁটে শিকারে যায়। বাইরে বিদেশী পোশাক, মুখমণ্ডলও মসৃণ। কিন্তু আসলে ভেতরে মুসলমান। কেবল নোতুন খোলসপরা নব্য শিক্ষিত মুসলমান।" (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১২ : ৪) এমনকি জমিদারদের একটা বড়ো শ্রেণিও সবকিছু হারিয়ে পালিয়েই যেন বেঁচে-বর্তে ছিল। সেই মুসলমানেরই আবার এক নতুন জাগরণ ঘটেছে, বিশেষ করে আলিগড়-আন্দোলন-এর প্রভাব কেন্দ্রের সাথে সাথে পূর্ব-বাংলাকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। যেই প্রভাব দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের মতো সাহিত্যও প্রভাবিত হয়েছে। (আনিসুজ্জামান, ২০১৪ : ৩১)

ফলে ওয়ালীউল্লাহ্ যে উপন্যাসের সূচনায় মুসলমান-চরিত্র নির্মাণের ফিরিস্তি দেন, তার একটা কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু তার সময় বেশ পরের; যদি তুলনা করা হয় 'নবোদ্ভিন্ন হিন্দু মধ্যবিত্তের' সাথে। এরও রয়েছে যৌক্তিক কারণ। হিন্দু মধ্যবিত্ত ধর্মীয় অন্তরায় কাটিয়ে ইংরেজ শিক্ষা গ্রহণ করেছে। কিন্তু মুসলমানরা সে কাজটা করতে পারেনি। 'সংস্কৃতি' থেকে 'ধর্মকে' প্রাধান্য দেওয়ায় এই বিষয়টা হয়ে ওঠেনি, ওঠা সম্ভব ছিল না। ওয়ালীউল্লাহ্র *লালসালু* উপন্যাসে বর্ণিত 'মক্তবভিত্তিক শিক্ষা-কার্যক্রম' এ কথাকেই স্পষ্ট করে। এ বিষয়ে একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

> ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে হিন্দু সমাজের সচেতন অংশের আগ্রহ এবং তাদের অর্থনৈতিক সামর্থ এর পশ্চাতে ভূমিকা রেখেছে বলে মনে হয়। তা ছাড়া তারা বুঝতে পেরেছিল যে ইংরেজ শাসন এদেশে দীর্ঘস্থায়ী হবে, ইংরেজি শিক্ষা অচিরেই প্রাধান্য পাবে। ফলে তারা মানসিকভাবে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিল। এক্ষেত্রে ধর্মও তাদের আগ্রহের অন্তরায় ছিল না। অন্যদিকে মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয় অংশ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। মুসলিম 'আশরাফ' শ্রেণি যারা অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে মধ্যবিত্তশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তারা অতীত ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন এবং নিজেদের সম্প্রদায়কে আধুনিক শিক্ষার পথ থেকে সফলভাবে সরিয়ে রেখেছিলেন। এই শ্রেণির মধ্য থেকে বাংলায় বসবাসকারী কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এই সময়ে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। (আবদুল বাছির, ২০১২ : ২০৪-২০৫)

ফলে সেই পূর্বস্মৃতি আর বর্তমানের [ঔপনিবেশিক শাসনামল] সঙ্গিন পরিস্থিতিই পূর্ব-বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়কে ভাবিয়েছে। এবং তারা আন্দোলন [নতুন ভূমির] করেছিল মূলত এই 'সাংস্কৃতিক' দূরত্ব ঘুচানোর জন্যই। এই ব্যাপারে 'ধর্মচৈতন্য' টেনে আনতে পারে যে কেউ;

সেক্ষেত্রে সদুত্তর হবে পূর্ব-বাংলার মানুষের ধর্মের বিষয়– যা গভীরভাবে সম্পৃক্ত ভূমি-গঠিত জীবন-মানসের সাথে। বিষয়টি তাদের শ্রেণি-পেশার আলোচনার বেলায়ও সমানভাবে গ্রহণীয়।

কিন্তু এর সাথে এ কথাও বলে নিতে হয় যে, নতুন ভূমি-ভিত্তিক রাষ্ট্র নির্মাণের ব্যাপারে ওয়ালীউল্লাহ্‌রও বিশেষ আগ্রহ ছিল। মুসলমানদের জন্য নতুন দেশের আবদার যারা করেছিল, তাদের মধ্যে ওয়ালীউল্লাহ্‌ও অবস্থান করেন। এসব থাকার পরও কিন্তু আলিগড়-আন্দোলন দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত ওয়ালীউল্লাহ্‌ হননি। কারণ যে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ আর ঐতিহ্যের কথা বার বার সে সময়কার সাহিত্যে বলা হচ্ছিল, সেই ব্যাপারে ওয়ালীউল্লাহ্‌র তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি। শেষাবধি 'স্যুট-কোট' পরা ওয়ালীউল্লাহ্‌ কিন্তু 'টুপি-পাঞ্জাবির' দেশ চাননি। তাঁর স্বপ্নে কলকাতা না হলেও আরেকটা 'নকল কলকাতার' স্বপ্ন বজায় ছিল। তাঁর চিন্তায় ছিল না যে পূর্ব-বাংলা 'আরব মুল্লুকের মরুভূমিতে' ঢাকা পড়ুক। ফলে ওয়ালীউল্লাহ্‌ পাকিস্তানের ভূমি ও তার ধর্মের সাথে পূর্ব-বাংলার যে পার্থক্য– তা বজায় রেখেছিলেন, বিশেষ করে বিষয়ে ও ভাষায়।

এই ব্যাপারে আরও বেশি সতর্ক ওয়ালীউল্লাহ্‌ হয়েছিলেন ভাষা-আন্দোলন পরবর্তী সময়ে। যে ওয়ালীউল্লাহ্‌ জিন্না মারা গেলে বলছেন, "কায়েদে আজমের মৃত্যু অপূরণীয়। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন এ যাবৎ পৃথিবীর মহত্তম ব্যক্তিদের একজন।" (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১৮: ৬, 'সাজ্জাদ শরিফ লিখিত ভূমিকাংশ') সেই ওয়ালীউল্লাহ্‌-ই বিশেষভাবে চিন্তিত থেকেছেন ষাটের দশকে, পাকিস্তানের ভগ্নপ্রায় দশা দেখে; পশ্চিম পাকিস্তানিদের নয়া-ঔপনিবেশিক কর্মকাণ্ডে পূর্ব-বাংলার জনগণের নির্যাতিত, নিষ্পেষিত আর বঞ্চিত হতে দেখে। লিখেছেন *কাঁদো নদী কাঁদো*র (১৯৬৮) মতো উপন্যাস। যে সময় এই উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে সেই সময়টাও বিবেচনা করা দরকার। "পূর্ববাংলার স্বাধিকার আন্দোলন যখন বেগবান হয়ে ক্রমাগত জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে, *কাঁদো নদী কাঁদো*র প্রকাশ সেই সময়ে, ১৯৬৮ সালে। সেই উত্তাল প্রেক্ষাপটে এ উপন্যাসে একটিমাত্র স্টিমার দিয়ে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে বাঁধা– যে সংযোগও কিনা একেবারে ছিন্নপ্রায়– কুমুরডাঙ্গা দ্বীপটির সঙ্গে পূর্ববাংলার আশ্চর্য মিল কীভাবে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল, সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার।" (সৈয়দ, ২০১৮: ৭, 'সাজ্জাদ শরিফ লিখিত ভূমিকাংশ') সাজ্জাদ শরিফের এই মন্তব্য নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। শরিফ যে বিষয়ে কথা বলেন, অস্তিত্ববাদী উপন্যাস হিসেবে বিস্তর পাঠের ফলে এই উপন্যাস-পাঠ অনেকটা ক্লিশে হয়ে পড়েছে। তারও রয়েছে নির্দিষ্ট কার্যকারণ।

এর জন্য ওয়ালীউল্লাহ্‌র বাস্তব-জীবনের দিকে একটু দৃক্‌পাত করা দরকার। মনে রাখা জরুরি যে, ওয়ালীউল্লাহ্‌র *চাঁদের অমাবস্যা* এবং *কাঁদো নদী কাঁদো* যখন প্রকাশিত হয়েছে তখন তিনি ফ্রান্সে সরকারি কাজে নিয়োজিত। ফ্রান্সের কেন্দ্রেই অবস্থান করেছেন। ১৯৬১ সালে ফ্রান্স-গমন (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১২ : ২৬৯) এবং সেখানকার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শন সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ তাঁর সাহিত্যের প্রকরণগত পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। এ সময়ে কেবল আধুনিক সাহিত্য বিবেচ্য বিষয় নয়, অ্যাবসার্ড (Absurd) নাটকেরও তখন রমরমা অবস্থা। এবং সেই সব নাট্যকার এবং নাটকের বিষয়-প্রকরণ-দর্শন– এর সবই নির্মিত হচ্ছে ফ্রান্সে। সেই প্রভাবেই কেবল ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে প্রকরণগত পরিবর্তন ঘটে গেল; দার্শনিক কিছু প্রপঞ্চও মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল তাঁর সাহিত্যে। কিন্তু বিষয় হিসেবে পূর্ব-বাংলাকে বাদ দিয়ে, পূর্ব-বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থাকে বাদ দিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে একেবারেই আগ্রহ দেখাননি ওয়ালীউল্লাহ্‌। বরঞ্চ সচেষ্ট থেকেছেন পূর্ব-বাংলার সাথেই; চিন্তিত

যে ছিলেন তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুই জানিয়ে দেয় আমাদের।

এই বিষয়ে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার খেয়াল করার আছে, পূর্ব-বাংলার ভাষার হিসেবের বেলায়। মানে আলিগড়-আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েও যে ওয়ালীউল্লাহ্ স্বতন্ত্র অবস্থান বজায় রেখেছিলেন, তার একটা গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন-সূত্র তাঁর উপন্যাসের ভাষা। কট্টর পাকিস্তান জাতীয়তাবাদী চিন্তা-সৃষ্ট প্রতিক্রিয়াশীলতায় নিমগ্ন হয়ে অন্যান্যের মতো তিনি তাঁর উপন্যাসে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'আরোপিত আরবি-ফারসির' ব্যবহারে উৎসাহী ছিলেন না। পূর্ব-বাংলার ভাষা যে স্বতন্ত্র, এমনকি কলকাতার ভাষার সাথে তুলনার বেলায়ও, বিশেষ করে আঞ্চলিক ভাষার হিসেব যদি করা হয়– সেই বিষয় ওয়ালীউল্লাহ্ বিশেষভাবে স্মরণে রেখেছেন।

এ কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, মুসলমানদের জন্য আলাদা ভূমি চাওয়ার পিছনে ওয়ালীউল্লাহ্র চিন্তায় কার্যকর থেকেছে এ অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের কথা। বিশেষ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বার্থ হাসিলের একটা উদ্দেশ্য তো ছিলই। কিন্তু 'পাঞ্জাবি বা টুপি' পরে ঘুরে বেড়ানোর স্বপ্ন ওয়ালীউল্লাহ্ কখনই দেখেননি। এই বিষয় তাঁর বাহ্যিক জীবনযাপন-সূত্রের মধ্যেই গ্রথিত ছিল, শেষাবধি। এক্ষেত্রে ওয়ালীউল্লাহ্র বিয়ের ব্যাপারটা যেমন আছে; তেমনি এর সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে জিন্নাহর ধর্ম পালনের বিষয়। ফলে পূর্ব-বাংলার ভাষা যে স্বতন্ত্র, এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের শাসকগোষ্ঠী ও তাদের পাকিস্তান রাষ্ট্রের পান্ডাদের ভাষার থেকে– এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার ফলেই মজিদের মুখের ভাষার সাথে আওয়ালপুরের পিরের ভাষার ফারাক ওয়ালীউল্লাহ্ নির্মাণ করেছেন। এমনকি এই বিষয় স্পষ্ট হয়েছে আওয়ালপুরের পিরের এবং তার সাঙাতদের মুখের ভাষার সাথে মহব্বতনগরের জনগণের ভাষার। তাই এই কথা বলতেই হবে যে, ভাষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও বিশেষভাবে সতর্ক ছিলেন ওয়ালীউল্লাহ্। ওয়ালীউল্লাহ্ আওয়ালপুরের পিরের ভাষার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে মজিদের ভাষাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, এ উপন্যাসে।

ধর্মবোধের বিষয়েও ওয়ালীউল্লাহ্ নিজস্ব অঞ্চলভিত্তিক [পূর্ব-বাংলা] ধর্মবোধের ব্যাপারটাকে সংযোজিত করেছেন তাঁর *লালসালু* উপন্যাসে। উপন্যাসের শুরুর দিকে খতনা করার বিষয়টা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন-সূত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই অঞ্চলে মুসলমানের আগমনের পূর্বে ধর্মীয় পরিস্থিতি কেমন ছিল, তা গভীরভাবে ভাবিয়েছে ওয়ালীউল্লাহ্কে। ব্যক্তিজীবনে তিনি নিজেও এই বিষয়ে যে চিন্তা-ভাবনা করেছেন : তা তাঁর স্ত্রীর সাম্প্রতিক প্রকাশিত স্মৃতিচারণামূলক লেখা থেকে স্পষ্ট হওয়া যায়। ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতা নয়; ধর্মের ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক বিষয়ে আগ্রহ ছিল ওয়ালীউল্লাহ্র। ফলে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ওয়ালীউল্লাহ্ অনেকটাই মুসলিম ছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় রীতিনীতির ব্যাপারে তাঁর ছিল না তেমন কোনো আগ্রহ। কিংবা ধর্মের প্রতিক্রিয়াশীলতা দ্বারা তিনি কোনোসময়ই প্রভাবিত হননি; নিশ্চয় আঘাত পেতেন, তা তাঁর লেখাজোখায় স্পষ্ট হয়েছে।

> ওয়ালী ছিল অবিশ্বাসী, কিংবা বলা যায় অজ্ঞেয়বাদী। তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ও মুসলমান হিসেবে গর্ব বোধ করত। ও অক্লান্তভাবে মুসলিম-বিশ্বের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে যেত। পশ্চিমা দেশগুলো যখন বর্বর ছিল, তখনকার মুসলিম সভ্যতার উৎকর্ষের প্রসঙ্গ উল্লেখ করত।... সালাদিনের মহত্ত্বের কথা বলত ও। আরব দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রুসেডের ভিন্ন একটি চিত্র আঁকত ও। (আন মারি, ২০১২ : ৫৬-৫৭)

সাংস্কৃতিকভাবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ এবং এর প্রভাবিত ধর্মবোধ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ধর্মীয় বিষয়াদি উপস্থাপনে সহায়তা করেছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এই কারণেই তিনি *লালসালু*তে বলতে পেরেছেন , "শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।" (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১২ : ৩) অর্থাৎ ভৌগোলিক ও আবহাওয়া-জলবায়ুর সাথে সাথে সংস্কৃতি, ইতিহাস, রাজনীতি কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে নির্দিষ্ট অঞ্চলের ধর্মকে : সে ব্যাপারে ওয়ালীউল্লাহ্‌ সজাগ ছিলেন। এছাড়া ধর্মের প্রতিক্রিয়াশীল এবং নেতিবাচকতার প্রতিও তাঁর বিরূপ মনোভাব বজায় ছিল। এই কারণেই হয়তো 'উদারনৈতিক ইসলামের' ইতিহাস-স্মৃতি তাঁকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল। পূর্ব-বাংলায় ঐতিহাসিকভাবে ইসলাম প্রচারের একটা প্রেক্ষাপট আছে– সে ব্যাপারেও ওয়ালীউল্লাহ্‌ অবশ্যই গভীর জ্ঞান রাখতেন। এ বিষয়ে সাম্প্রতিক একজন ঐতিহাসিকের মতামত বিষয়টাকে স্পষ্ট করবে : বিষয়টা ধর্ম, ভাষা ও অভিবাসী মুসলমান বিষয়কে স্পষ্ট ইতিহাস-ভিত্তি প্রদান করবে। যার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় ওয়ালীউল্লাহ্‌র ধর্মবোধের।

> কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ধর্মান্তরের অনুমানকে সমর্থন করে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বিপুল পরিমাণ নিম্নবর্ণের হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করেছে। যদি ইসলাম ধর্ম শুধু অভিবাসী মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে বাংলা ভাষা নিয়ে চতুর্দশ শতক থেকে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আত্মপরিচয়ের সংকট দেখা দিত না। (আকবর আলি, ২০১৯ : ২৪)

এই ধর্মান্তরকরণের চিহ্ন-সূত্র ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর *লালসালু* উপন্যাসে সরবরাহ করেছেন। বিশেষ করে মজিদের মহব্বতনগর গ্রামে আসার পরপরই খতনা করার ব্যাপারটা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। নির্দিষ্ট কিন্তু কৃত্রিম, এক মাজারকে কেন্দ্র করে যে ধর্মীয়করণ প্রক্রিয়া শুরু করেছিল মজিদ– তা অনেকটাই রূপকার্থের ভিতর দিয়ে মিলে যায় পূর্ব-বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রচারণার সাথে। যেমনটা দেখিয়েছেন ওয়ালীউল্লাহ্‌।

> বাপ আবার বলে, খোদার কসম, ওর খৎনা হইছে। কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে মজিদ বিদ্যুদ্বেগে ছুটে গিয়ে ধাঁ করে তুলে ফেলে তার লুঙ্গি। ছেলেটি পালাবার উপক্রম করছিল, থাবা দিয়ে তার ঘাড় ধরে ফেলে মজিদ। বাপও পালাই পালাই করছিল, কিন্তু কীভাবে পালায় ভেবে না পেয়ে ওখানেই বোকার মতো চোখ মেলে বসে থাকে। খানিকক্ষণ বাপ-পুতকে একসঙ্গে গালাগাল করে ছেলেটিকে ধরে নিয়ে এসে মজিদ নিজের বাইরের ঘরে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। বলে,
>
> —আইজ নামাজের পর আমিই তোর খৎনা দিমু। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১২ : ১১)

লালসালু উপন্যাসে মাজারভিত্তিক পির সংস্কৃতির যে ভণ্ডামির কথা সমালোচকরা বারবার বলেন, তার আসলে সত্যতা রয়েছে। বিশেষ করে ওয়ালীউল্লাহ্‌ লিখিত *বহিপীর* (১৯৬০) নাটকের পিরদের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছিল। কিন্তু সেই 'পিরেদের' সাথে '*লালসালু*র পীরের' রয়েছে পার্থক্য, নানান বিষয়ের চিহ্ন-সূত্র তা স্পষ্ট করে। কারণ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু*র 'মজিদের মতো পিরের' ভূমি-সংলগ্নতার বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু *বহিপীর* (১৯৬০) নাটকের 'পিরেদের' সাথে এই ব্যাপারটা সম্পৃক্ত থাকেনি পুরোপুরি। এছাড়া যেমন রয়েছে মারফতি মতের বিষয়, পূর্ব-বাংলায়। কারণ নিম্নশ্রেণির মুসলমান, যারা বিবেচিত 'আতরাফ' হিসেবে, তাদের সাথে একটা বড়ো পার্থক্য রয়েছে উচ্চশ্রেণির মুসলমান হিসেবে

বিবেচিত 'আশরাফদের'। এই দ্বন্দ্বও প্রকটিত হয়েছে *লালসালু* উপন্যাসে। এই বিষয় পূর্ব-বাংলায় প্রচলিত কিংবদন্তি-পাঠের মাধ্যমে স্পষ্ট হওয়া সম্ভব।

> একটি দেশ বা অঞ্চলের কাছে যা 'বিশ্বাস' অন্য ভৌগোলিক পরিবেশে অন্য জাতির নিকটে তা 'সংস্কার' হিসেবেও পরিগণিত হতে পারে। নৃতাত্ত্বিক বিচারে একটি দেশ, জাতি বা অঞ্চল একটি বিশেষ পরিমণ্ডলীভুক্ত প্রবহমান ঐতিহ্যের মধ্যে গড়ে উঠে— এ ঐতিহ্যে থাকে তার ধর্ম, পূজা-প্রার্থনা, উৎসব-উপাচার, খাদ্য-খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিশ্বাস-সংস্কার। (আশরাফ সিদ্দিকী, ২০১০ : ১৬৯)

বিশেষ করে ধর্ম-পালনের অভিজ্ঞতা এবং ধর্মের উদ্ভবের নানা অভিজ্ঞতায় আশরাফ শ্রেণির মুসলমানের অভিজ্ঞতার সাথে দুরপনেয় সম্পর্ক বিদ্যমান আতরাফ শ্রেণির মুসলমানের। তাই নামাজ পড়ার রীতি এবং ইসলামের অন্যান্য পালনীয় বিষয়ের মধ্যে একটা বিরোধের চিত্র ওয়ালীউল্লাহ্ এই [*লালসালু*] উপন্যাসে হাজির করেন। এই হাজিরকৃত দ্বন্দ্বে আতরাফ বা নিম্নবর্গের মুসলমানদের পির হিসেবে কিন্তু মজিদেরই জয় হয়েছে। এবং পরাজিত হয়ে পির যে গাছে চড়ে বসে, তাও এক স্যাটায়ার-নির্মিত বিজয়-চিহ্নবিশেষ, মজিদের জন্য। আর গাছে চড়ে বসা পিরের মাধ্যমে কেবল সাধারণ স্যাটায়রই নির্মিত হয়েছে এমন নয়— একইসাথে একই ধর্মের বর্গভিত্তিক পার্থক্যের হিসেবটা সুস্পষ্ট হয়েছে। এছাড়া এই দুই শ্রেণির সাথে সাংঘর্ষিক তুলনার উদাহরণও ওয়ালীউল্লাহ্ দিয়েছেন।

> কিন্তু জাঁদরেল পীররা যখন আশে-পাশে এসে আস্তানা গাড়েন তখন মজিদ কিন্তু শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ভয় হয়, তার বিস্তৃত প্রভাব কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো মিলিয়ে যাবে, অন্য এক ব্যক্তি এসে যে— বৃহৎ মায়াজাল বিস্তার করবে তাতে সবাই একে-একে জড়িয়ে পড়বে। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১২ : ২৪)

জেমস ওয়াইজ (James Fawns Norton Wise, 1835-1886) পূর্ব-বাংলার লৌকিক ধর্ম ও জাতি-বর্ণ-পেশা বিষয়ে যা বলেছেন, তাও নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে জাতি-বর্ণ-পেশার সাথে ও ধর্ম-চৈতন্যের ব্যাপারে। এছাড়া দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসারে সক্রিয়তা নিয়েও বিশেষ তাঁর মন্তব্য; সম্পৃক্ততা পাওয়া যায় ওয়ালীউল্লাহ্র চিন্তার সাথে এই চিন্তার। (ওয়াইজ, ২০০০ : ২৩-২৫)

ওয়ালীউল্লাহ্ উপন্যাসের শুরুতেই যে ফিরিস্তি দেন, বিশেষ করে মজিদের জন্মভূমির বাস্তবতা বিষয়ে, সেই বাস্তবতায় বলতে হয় মধ্যপ্রাচ্যের সুফি ঘরানার পির ও শরীয়তপন্থি পিরদের সাথে কার্যত বিপরীত ভূমিকা পালন করেছে মারফতিপন্থিরা। *লালসালু* উপন্যাসে ফসলের কল্যাণ-কামনা করে মাঠে শিঙা বাজানো, কিংবা ছাই ছিটানোর ব্যাপারটা এই বিষয়েরই নির্দেশ করে। এর পিছনে নদী, ভূমি, ফসল, উর্বরতার মতো গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক-উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। কারণ পূর্ব-বাংলা মানুষের সাথে নদীর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর ফসল উৎপাদন কিংবা আর্থ-উৎপাদন-কাঠামোয় গুরুত্বের দাবিদার ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু। ফলে ধর্মের উদ্ভব-ইতিহাস একেবারেই অলৌকিক নয়। এমনকি বৈশ্বিক ধর্মের উদ্ভব-ইতিহাসের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সভ্যতার বাস্তবতায় ধর্মের উদ্ভবের ইতিহাস-বিবর্তন। আবার এ প্রশ্নও জাগে, এক অলৌকিক অচেতনেই কি ধর্মের উদ্ভব হয়ে গেল? না, এ কথা যৌক্তিক নয়। এক্ষেত্রে একটি উক্তি এ বিষয়ের সত্য ও যৌক্তিক ভিত্তি প্রদান করবে।

> The study of the mythological systems of ancient nations has revealed many curious and unlooked-for facts and correspondences. It has been made apparent, in the first place, that those mythologies had their origin in primitive ideas about the movements of the heavenly bodies, the variations of day and night , summer and winter, and other natural phenomena, which were in time, through the modification of human ideas, transformed into the doings of a throng of deific beings. The worshippers did not know whence came their gods. We, who can approach the subject without prejudice and bigotry, and to whom mythology has ceased to be sacred, can easily trace their origin, and point out nearly every step of their unfoldment. It has become evident, in the second place, that a close affinity exists between the mythological ideas of different and often widely separated countries, the resemblance extending not only to their broader features, but in some cases to their mind or details of dogma and belief. (Titcomb, 1889 : 13-14)

এই একই প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকবে পূর্ব-বাংলার মানুষের ধর্ম-চৈতন্যের উদ্ভব ও বিকাশ-ইতিহাসের সাথে– এ কথা পূর্বোক্ত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে বলা যায়। ফলে পূর্ব-বাংলার কৃষক শ্রেণির ধর্ম-চৈতন্যের পিছনে কাজ করেছে এ অঞ্চলের ভূমি-অভিজ্ঞতা ও ভূমি-প্রভাব। বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভবও এই বাস্তবতা মেনেই হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরত্যাগের চেয়ে বাস্তবতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। "The Buddha did not deny the gods, therefore, but believed that the ultimate reality of nirvana was higher than gods." (Armstrong, 1993 : 43) ফলে এই একই প্রক্রিয়ায় শরিয়তপন্থি ধর্মচৈতন্য-অবলম্বনের চেয়ে মারফতপন্থি ধর্মচৈতন্য-অবলম্বনের প্রতি ঝোঁক রয়েছে পূর্ব-বাংলার জনগণের। এই কারণেই পূর্ব-বাংলায় লোকায়ত ধর্মের প্রভাব এত বেশি। তাই *লালসালু* উপন্যাসের কৃষকদের শরিয়ত-বিরোধি কর্মকাণ্ডের রয়েছে সুস্পষ্ট কার্যকারণ সূত্র। ফলে আসমানি-চৈতন্য তাদের ওপর সহজে প্রভাব ফেলতে পারেনি। এ বিষয়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌ নিজেও উপন্যাসে বলছেন :

> কাতারে কাতারে সারবন্দি হয়ে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কাস্তে নিয়ে মজুররা যখন ধান কাটে আর বুক ফাটিয়ে গীত গায় তখনো মজিদ দূরে দাঁড়িয়ে দেখে আর ভাবে। গলার তামার খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বর গুঁতোয় আর ভাবে। কিসের এত গান, এত আনন্দ? মজিদের চোখ ছোট হয়ে আসে। রহিমার শরীরে তো এদেরই রক্ত, আর তার মতোই এরা তাগড়া, গাট্টাগোট্টা ও প্রশস্ত। রহিমার চোখে ভয় দেখেছে মজিদ। এরা কি ভয় পাবে না? ওদের গান আকাশে ভাসে, ঝিলমিল করতে থাকা ধানের শীষে এদের আকর্ণ হাসির ঝলক লাগে। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১২ : ৯)

ধর্মতন্ত্র ও ক্ষমতা-কাঠামো, সেটা কেবল সামন্ততন্ত্র বলে নয়, এখনো আধুনিক যুগেও ক্ষমতা-কাঠামোর সাথে ধর্মতন্ত্রের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। এভাবেই এখনো ক্ষমতা-কাঠামো আর ধর্মতন্ত্রের যোগসাজশে একটা আধিপত্য সমাজে ক্ষমতার বিস্তার ঘটায়। সেই বিষয়ও স্পষ্ট করেছেন ওয়ালীউল্লাহ্‌, তাঁর এই উপন্যাসে। ওয়ালীউল্লাহ্‌ উপন্যাসের একস্থানে বলছেন এমনটা।

> এবং সমাজের মূল হল একটি লোক– যার আঙ্গুলের ইশারায় গ্রাম ওঠে-বসে, সাদাকে কালো বলে, আসমানকে জমিন বলে। সে হল মজিদ। জীবনস্রোতে দুজনের পক্ষে উলটো পথে যাওয়া সম্ভব নয়। একজনের আছে মাজার, আরেক জনের জমি-জোতের প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১২ : ৩১)

নারীবাদী চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি এই উপন্যাসের নারী-চরিত্র; বিশেষ করে জমিলা। কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্বের ভিত্তিতে নয়, ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই উপন্যাসের নারীবাদী-চিন্তা সকর্মক ভূমিকা পালন করেছে। রহিমা চরিত্রের মাধ্যমে পূর্ব-বাংলার নারীর টাইপ চরিত্র নির্মাণ করেছেন ওয়ালীউল্লাহ্। কিন্তু মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা আবার রহিমার এই টাইপ-চরিত্র ভেঙে দেয়, বিপরীতে অবস্থান নেয়। বিশেষ করে প্রথাগত ধর্মতন্ত্র আর পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য ও অধীনতা থেকে মুক্তি পেতে তার প্রয়াস এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। পুরুষতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্রের নিবিড় যোগসাজশে যে আধিপত্য নারীকে সহ্য করতে হয়, তার বিরুদ্ধে জমিলা চরিত্র বিদ্রোহী। তার বিদ্রোহ কোনো গ্রন্থগত নারীবাদ নয়। প্রায়োগিক নারীবাদী চিন্তার তুরীয় উদাহরণ জমিলার নানান কর্মকাণ্ড।

ইউটোপিয়ান পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদে নিজেকে অন্তর্ভুক্তিকরণেরও ওয়ালীউল্লাহ্ নানাভাবে 'পাকিস্তান নামক অবাস্তব (Utopian) রাষ্ট্রের' একটা অংশ দ্বারা আরেকটা অংশের শোষিত-নির্যাতিত-নিষ্পেষিত হওয়ার দীর্ঘ ইতিহাস ওয়ালীউল্লাহ্‌কে তাঁর পূর্বতন দৃঢ় রাজনৈতিক বিশ্বাসে ফাটল ধরায়। এবং যে 'সাংস্কৃতিক' উন্নয়নের স্বপ্ন ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর প্রথম জীবনে দেখেছিলেন এবং তাঁর চিন্তা-চেতনায় ধারণ করেছিলেন খুব দ্রুতই তা বদলে যায়। ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর বিগত কাল্পনিক স্বপ্নের বীভৎসতা এবং কুৎসিত রূপ দেখে যারপরনাই মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। ব্যথিত তো হয়েছিলেনই। আর এইসব মনঃক্ষোভ শেষপর্যন্ত তাঁর পূর্বতন বিশ্বাসে যেমন চিড় ধরায়, তেমনি করে সেইস্থান দখল করে নেয় বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তা। কিন্তু সর্বসমক্ষে সেই চিন্তার প্রকাশ ঘটানো সম্ভবপর ছিল না তাঁর পক্ষে। তা ব্যক্তিক ক্ষেত্রেও ওয়ালীউল্লাহ্‌র দ্বারা করে ফেলা সম্ভব ছিল না। ভাষা আন্দোলনের প্রভাব হয়তোবা টের পেয়েছিলেন ওয়ালীউল্লাহ্; আর তাই মোড় নিয়েছিল তাঁর চিন্তা। সেই চিন্তা *লালসালু*তে যেভাবে ছিল তার চেয়ে বেশি সংক্রমিত হয়েছিল তাঁর অপর দুটি বাংলা উপন্যাসে। তবে *লালসালু*তে সেই চিন্তা একেবারেই রহিত হয়নি। কিন্তু টের পাওয়া বেশ কঠিন। এক্ষেত্রে হুমায়ুন আজাদের মন্তব্য বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য।

> কিন্তু সাতচল্লিশের আগে থেকেই পাকিস্তানি স্বাধীনতা সম্পর্কে এরকম সন্দেহ জাগে অধিকাংশ বাঙালি মুসলমানের মনে;— এমনকি যারা পাকিস্তানি ঝাণ্ডা উঁচিয়ে ধ'রে প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলো পাকিস্তান ও ইসলামের, তাদের অসহায়ত্বও চোখ এড়ায় না। যতো অভিলাষ আর স্বপ্ন ছিলো, তা সম্ভবত বাস্তবায়িত হবে না— এমন একটা বোধ ছড়িয়ে পড়েছিলো সম্ভবত পূর্ব বাঙলার মানুষের মধ্যে। এ-বোধ পাকিস্তানি স্বাধীনতা লাভের সময় থেকে নানাভাবে প্রকাশ পেতে থাকে তখনকার সাহিত্যে। (হুমায়ুন আজাদ, ২০০৫ : ৬৭)

এক্ষেত্রে যে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন এই বলে, পূর্বোক্ত জিন্নাহকে সমর্থনের বিষয়টা তাহলে আদতে কী ছিল? সময়টা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৪৮ সালে। দেশভাগের পরপরই। যার মাঝে একটা বড়ো সমস্যা এসে হাজির হয়েছে, তা নিয়ে আন্দোলন চলছে— হ্যাঁ, ভাষা আন্দোলন তখন তুঙ্গ পর্যায়ে। স্মরণে রাখা জরুরি মহৎ লেখক মাত্রই দূরদর্শী হন। সময়-প্রভাবে ইতিবাচক দিকেই ধাবিত হন। ওয়ালীউল্লাহ্ তার ব্যতিক্রম নন।

*লালসালু*র পরে প্রকাশিত *দুই তীর ও অন্যান্য গল্পে*র (১৯৬৫) 'গ্রীষ্মের ছুটি' গল্পেও ষাটের দশকের বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং ধর্মীয় উন্মাদনার বিকৃত চিত্রই ধরা পড়েছে। তারা মিঞার হত্যাকাণ্ড, আর তা নিয়ে সেলিনা, দাদাসাহেব আর আম-মৌলবীর কর্মকাণ্ডে।

(সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, ২০১৭ : ৮৯-৯৫) যে গল্প-প্লট নির্মাণ হয়েছে তা স্পষ্টাভাবে ধারণ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও পাকিস্তানের মুদ্রা-বৈষম্য– যা দুই দেশ দুই অর্থনীতির তত্ত্বের মতোই।

এই একই প্রক্রিয়ায় ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্য-পাঠ জরুরি। তাহলে ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যের বৈষয়িক ব্যাপারগুলো 'দিবা-রাত্রির' সংকট কাটিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ প্রসঙ্গে আরও কিছু বিষয় সংযুক্ত করা দরকার। ওয়ালীউল্লাহ্‌ প্রথমদিকে [চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে] যে সমর্থন জুগিয়েছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনে তার ফল তিনি পেয়েছিলেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি চাকরি পেয়েছিলেন; তবে তা তো অবশ্যই যোগ্যতা বাদে নয়, যোগ্যতার দিক থেকেও তিনি সবদিক থেকেই যোগ্য ছিলেন[৪]। কিন্তু নিজের চাকরির ব্যাপার, এবং নিজের বোধের যে দ্বন্দ্ব তা তাঁকে আসলে মানসিকভাবে ভারাক্রান্ত রেখেছিল বহুদিন যাবৎ। এরই ফলে ওয়ালীউল্লাহ্‌ সরাসরি কিছু বলেননি, যেমনটা বলেছিলেন *লালসালু*তে। কিন্তু *কাঁদো নদী কাঁদো* কিংবা *চাঁদের অমাবস্যা*তে *লালসালু*র চেয়ে বেশি 'রাজনৈতিক বয়ান' (Political Narrative) উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু কৌশলগত কারণেই তা বিমূর্ত হয়ে ধরা পড়ে; একটু গভীর পর্যবেক্ষণে তা আবার মূর্ত হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে সাজ্জাদ শরিফের পূর্বোক্ত মন্তব্যই যথার্থ।

'ব্যক্তিক বোধ ও চিন্তা 'আধুনিক' সাহিত্যের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। 'আধুনিক' কবিতা-ভাষায় যেমন বিষয়টা বিশেষভাবে উপস্থাপিত হয়, তেমনি করে উপন্যাসের ভাষায়ও এই ব্যক্তিক-বোধ বিশেষভাবে কার্যকর থাকে। ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসের ভাষায়ও এই বিষয়টা কেউ কেউ খেয়াল করেছেন।

> পূর্ব বাংলার উপন্যাসের আঙ্গিকের মতই ভাষার নৈপুণ্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। প্রতিটি উপন্যাসেই তাঁর ভাষা ব্যক্তি-মানসের জটিলরূপকে প্রকাশ করেছে অসাধারণ ব্যঞ্জনায়।... সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসের ভাষাও ব্যক্তিমানসের জটিলতম স্তরগুলিকে ব্যঞ্জিত করার ক্ষেত্রে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন। (শাহীদা, ১৯৯২ : ১৯২)

কিন্তু কেবলই যে এই ভাষা [ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসের ভাষা] ব্যক্তিকতার ওপর ভিত্তি করেই বেড়ে উঠেছে এমনটা পুরোপুরি সত্য নয়; সত্য হলেও তা উপরিকাঠামোয় (Superstructure) আংশিক সত্য। কারণ এই ব্যক্তিক ভাষাবোধ আর ভাষা-নৈপুণ্য যুগপৎভাবে ব্যক্তিকতা আর নৈর্ব্যক্তিকতা– এই দুই বিষয়কেই ধারণ করেছে। ফলে ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু* উপন্যাসের ভাষা নানা কারণে আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিক বলে মনে হলেও এর ভিতর-কাঠামোয় লুক্কায়িত রয়েছে নৈর্ব্যক্তিক নানা বিষয়াদি। এমনকি ব্যক্তিক অস্তিত্বের বেলায় এই ব্যাপারটা সমানভাবে কার্যকারী। ওয়ালীউল্লাহ্‌ যে তাঁর সাহিত্যে নানারকম রং, বর্ণ, প্রকৃতি, মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়-ঝঞ্ঝা উপস্থাপন করেন তা তাঁর প্রিয় বিষয় যেমন, তেমনি ফরাসি সাহিত্যের নানা প্রভাব এক্ষেত্রে কার্যকারী এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। ব্যক্তিকতায় নৈর্ব্যক্তিকতা ধরতে পারার বিষয়টা আরও নানামাত্রায় মেলানো যেতে পারে দূরান্বয়ী অ্যাবসার্ড নাটকের ভাষাবোধের সাথে।

ফ্রান্সে বসবাসের সময়ও এই ব্যাপারটা তাঁর সাহিত্য-মানসকে প্রভাবিত করেছিল। বিশেষ করে এই সময় তিনি অ্যাবসার্ড নাটকের কৌশল ও দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। যুগ-বাস্তবতায় তার ব্যক্তিজীবন তো সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; সে [যে কোনো ব্যক্তি] যতই বলুক না কেন যে সে রাজনৈতিক চিন্তার বাইরের লোক। ফলে এই ব্যাপারটাই ঘটে

গেছে ওয়ালীউল্লাহ্‌র নিজ জীবনেও, সংগোপনে। ওয়ালীউল্লাহ্ যদিও তা প্রকাশ করেননি বলে মনে হয় আপাতদৃষ্টিতে; কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় যেন আরও বেশি। কিন্তু তার কৌশলটা ভিন্ন; দার্শনিক অভিপ্রায়েও ব্যাপারটা কেমন যেন মাটিছাড়া– এই যা। এ ব্যাপারে ওয়ালীউল্লাহ্ ফ্রান্সে অবস্থানকালীন নানা প্রভাব তাঁর ওপর পড়েছিল। বিশেষ করে অ্যাবসার্ড নাটক আর নাট্যকারদের প্রভাব। এ বিষয়ে একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

> দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে জীবনের শূন্যতা, একাকিত্ব, আত্ম-বিচ্ছিন্নতা, ঈশ্বর-বিচ্ছিন্নতা, নৈঃসঙ্গ্য, অন্তহীন ক্লান্তি, অর্থহীন ভবিষ্যৎ এবং অস্তিত্বের দুর্ভর যন্ত্রণা উপস্থাপনে একদল নাট্যকার সচেতনভাবে এ্যাবসার্ড আঙ্গিকে নাটক নির্মাণ করেন। এই নাটকে চরিত্র-বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা কিংবা ঘটনাংশের ক্রমবিকাশ থাকে না; বরং তার জায়গায় পাই কাব্যময়তা আর প্রতীকী ব্যঞ্জনাময় পরিণাম-চিত্র। (বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০০৯ : ২৭১)

সেই প্রভাবে তিনি নাটকও রচনা করেছিলেন। এমনকি উপন্যাসের বেলায় তাঁর পূর্বতন প্রকরণ-কৌশল [বিশেষভাবে *লালসালু*] বদলে গিয়েছিল। ওয়ালীউল্লাহ্ বিষয়-আশয় ঠিকঠাক রেখে কেবল বদলেছিলেন প্রকরণ। তাতেই ঘটে গেছে বিরাট কাণ্ড– নেই, কিছু নেই ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে– এই বলে একদল সারা সাহিত্যপাড়া মাথায় করে চিৎকারে ব্যাপৃত থেকেছে। আবার আরেকটি দল কেবল প্রকরণ-কৌশল নিয়েই সময় পার করেছে। কিন্তু ভেবে দেখার দরকার আছে যে, স্যামুয়েল বেকেট (Samuel Beckett, 19065-1089) যে তাঁর বিখ্যাত অ্যাবসার্ড নাটক *গডোর প্রতীক্ষায়* (*Waiting for Godot, 1952*) রচনা করেন তা কেবলই বৈষয়িক দিক থেকে নিরর্থকতাকেই (Absurdity) ধারণ করে না; এই 'নিরর্থকতা' আসলে নিরাকার কার্যকলাপের মাধ্যমে সাকারকে উপস্থাপনেরই এক দুর্দান্ত কৌশল– তা ভুলে গেলে চলবে না।

কিন্তু জ্যাঁ জেনের (Jean Genet, 1910-1986) বিখ্যাত অ্যাবসার্ড নাটক– অ্যাবসার্ড নাটকের প্রধান তাত্ত্বিক মার্টিন এসলিন (Martin Esslin, 1918-2002) যে নাটককে অ্যাবসার্ড নাটকের 'মাস্টারপিস' বলে আখ্যায়িত করেছেন (সোহানুজ্জামান, ২০১৬ : ২৯২)– *দ্য ব্যালকনি* (*The Balcony, 1956*) যেমন একটি ব্যালকনিতেই উপস্থাপিত হয়েছিল– এক 'নাগরিক ব্যালকনিতেই' শেষ হয়েছে এই নাটকের কাহিনি। এই যে অ্যাবসার্ড নাটকের একজন নাট্যকারের একটা নাটকের উদাহরণ দেওয়া হলো, এই ধারায় আরও অনেকেই আছেন, তা দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন ওয়ালীউল্লাহ্। কিন্তু অ্যাবসার্ড নাটকের এই রমরমা সময়ে, যা দ্বারা তিনি প্রভাবিতও হয়েছিলেন, ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর উপন্যাসের বিষয় হিসেবে *দ্য ব্যালকনি*-এর বিষয়ের মতো ক্ষুদ্র বিষয়কে গ্রহণ করেননি, গ্রহণ করেছেন এক বিস্তৃত প্রেক্ষাপট-ভিত্তিক বিষয়। যা তাঁর উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপটগত বিষয়ের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে। অর্থাৎ প্রকরণের বেলায় ওয়ালীউল্লাহ্ বারবার ব্যবহার করেছেন পাশ্চাত্যের উপন্যাস-কাঠামো; যা ক্রমশই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। যদি আপত্তি তুলে কেউ বলেন যে ওয়ালীউল্লাহ্ তো *লালসালু* উপন্যাসে আখ্যান-বর্ণনায় ধারাবাহিক কাঠামোটাই ব্যবহার করেছেন সেক্ষেত্রে বলতে হবে যে, এই আধুনিক কিন্তু চৈতন্যপ্রবাহরীতি সম্পৃক্ত নয়। এ কথা সর্বাংশে সত্য। যেমনটা তিনি *চাঁদের অমাবস্যায়* (১৯৬৪) কিংবা *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮) উপন্যাসে আখ্যান-বর্ণনা করেছিলেন– তা থেকে *লালসালু* উপন্যাসের আখ্যান-বয়ান-প্রক্রিয়া

একটু পূর্ববর্তী চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বৈষয়িক চিন্তা অনেকাংশেই অগ্রবর্তী– এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

উপরিউক্ত আলোচনায় সৃষ্ট প্রেক্ষাপট নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসের পাঠের ক্ষেত্রে। কারণ প্রকরণগত আলোচনায় তাঁর [ওয়ালীউল্লাহ্‌র] উপন্যাসের বিষয়গত আলোচনা স্বভাতই অনেকটা অনালোচিত থাকে। ফলে গভীর ও তীক্ষ্ণ প্রকাশভঙ্গিমার অন্তরালে যে একটা বিস্তৃত জনজীবন এবং তার কার্যকারণ সূত্র লুক্কায়িত থাকে তা হরহামেশাই বাদ পড়ে যায়। কিন্তু সেই প্রকরণের যে কোনো মূল্য নেই তা বলা একেবারেই নিরর্থকতা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ প্রকাশভঙ্গি কিংবা বয়ানের পরিবর্তনও উপন্যাস-সাহিত্যের ক্রমায়ত পরিবর্তন ও উন্নয়নের মৌল শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে ওয়ালীউল্লাহ্‌ যে প্রকরণরীতি ব্যবহার করেন তা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক শিল্পের করণকৌশল এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে; আর সেক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহার তো নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। সৈয়দ আকরম হোসেনের উক্তি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।

> আধুনিক উপন্যাসের শব্দনির্বাচন মূলত চেতনা, অনুধ্যান ও অস্তিত্ব-উপাসনার বিষয়। বিশ্বযুদ্ধোত্তর উপন্যাসে শব্দ উৎসারিত হয় ঔপন্যাসিকের সমগ্র মনের গভীর-গভীরতর চেতন-অচেতনকেন্দ্র কিংবা স্মৃতি-উৎস থেকে এবং সৃষ্টিকর্মে সে-সব শব্দ সক্রিয় হয় অনুসূক্ষ্ম মেধায়, আবেগে-অনুভবে। (সৈয়দ আকরম, ২০২০ : ৮২)

সৈয়দ আকরম হোসেনের এই মন্তব্য নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক সাহিত্যে প্রকাশভঙ্গিই প্রধানতম এর বৈশিষ্ট্য। কারণ উইলিয়াম জেমসের বিখ্যাত মনস্তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ *প্রিন্সিপলস্‌ অব সাইকোলজি (Principles of Psychology, 1890)* প্রকাশিত হওয়ার পরই মূলত পুরোনো উপন্যাস-বয়ান-কৌশল (Narration-Technique) বদলে যেতে থাকে। নতুন নতুন উপন্যাস এই পুস্তক-পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত হতে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম জেমস জয়েসের (James Augustine Aloysius Joyce, 1882-1941) *ইউলিসিস* (*Ulysses, 1922*) ও ভার্জিনিয়া উলফের (Adeline Virginia Woolf, 1882-1941) উপন্যাস *মিসেস ড্যালওয়ে* (*Mrs Dalloway, 1925*)। বিশেষ করে ইউলিসিস। যে উপন্যাসের বয়ান কোনো প্রথাগত ধারাবহিক আর কৌলিক বর্ণনা কৌশল মানে না। নির্মিত হয় একটা চৈতন্যপ্রবাহরীতির আখ্যান বর্ণনা-কৌশলের মাধ্যমে। আসলে আধুনিক সাহিত্যে উপস্থাপনরীতিটাই বিশেষভাবে জরুরি– অর্থাৎ উপস্থাপন-রীতি গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে, বিষয়ের চেয়ে। কিন্তু তিনি কেবল উপস্থাপনরীতিরই ভিন্নতা এনেছেন তা নয়। তাঁর উপন্যাসে বিষয় হিসেবে যে সমস্ত বিষয় তিনি একত্রিত করেছেন তা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয় যেমন সক্রিয় থেকেছে তাঁর প্রথম উপন্যাস *লালসালু*তে, তেমনি সক্রিয় থেকেছে পরবর্তী চৈতন্যপ্রবাহরীতিকে ভিত্তি করে নির্মিত উপন্যাস-আখ্যানে।

নয়নচারা গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে; সেই গল্পগ্রন্থের টেকনিক কিন্তু 'আধুনিক' আর চৈতন্যপ্রবাহরীতির। ফলে বলার জো নেই যে তিনি এ ব্যাপার একেবারেই ফ্রান্সে গিয়ে আমদানি করেছেন তাঁর সাহিত্যে। সবচেয়ে বড়ো বিষয় তাঁর গভীর পাঠাভ্যাস। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ ছিলেন "এক সর্বভুক পাঠক।" (আন মারি, ২০১২ : ৩৮) তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পড়তেন। সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত দেশ-বিদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্প সম্পর্কে ওয়ালীউল্লাহ্‌ খোঁজখবর রাখতেন এবং সেসব বই-পুস্তক সংগ্রহ করে পড়তেন। বিশেষ করে

আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর তীব্র আগ্রহ। এছাড়া রুশ, ফরাসি, আইরিশ, আমেরিকান, ইতালিয়ানসহ নানান দেশের সাম্প্রতিক সাহিত্য যেমন তিনি পাঠ করেছিলেন; তেমনি ক্লাসিক, রোমান্টিক কিংবা বাস্তববাদী সাহিত্যের প্রতিও ছিল তাঁর সমান আগ্রহ। (আন মারি, ২০১২ : ৩৮-৪৪)

কিন্তু প্রকরণ এবং বিষয়ে একেবারেই স্বচ্ছতার কারণ কী কী ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু*তে? এরও কারণ নির্মাণ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনী ঘাটলেই স্পষ্ট হয়ে পড়বে। ওয়ালীউল্লাহ্‌র কলকাতায় বসবাসের ইতিহাস এবং সেখানকার শিল্প-সাহিত্যের কৌলিক বয়ান-কৌশল (Lineal Narration Technique) তাঁকে যেভাবে প্রভাবিত করেছিল সেই প্রভাবই ওয়ালীউল্লাহ্‌ *লালসালু*তে উপস্থাপন করেছেন। ফলে ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত *লালসালু*র সাথে যোজন যোজন পার্থক্য নির্মাণ করেন সমালোচকরা। কিন্তু কী নিদারুণ দুঃখের বিষয় যে, এই পার্থক্য কেবলই প্রকরণে, নিজের [ওয়ালীউল্লাহ্‌র] সাহিত্যে-যাপন-অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত। ঔপন্যাসিক শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) প্রথম উপন্যাস *জননী* (১৯৫৮) পাঠের বেলায় যে সমস্ত কথা বলতে চাননি, তা ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস-চিন্তায় সক্রিয় থেকেছে। এ বিষয়ে আন মারি ওয়ালীউল্লাহ্‌ বলছেন,"তবে ওর মূল লক্ষ্য ছিল পূর্ব বাংলার গ্রামের মানুষদের নিয়ে লেখা। ওয়ালী হয়তো আধুনিক চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবে। তবে এগুলো ও প্রয়োগ করেছে নিজ দেশের পরিস্থিতিতে।" (আন মারি, ২০১২ : ৫৪-৫৫)

পরিশেষে এই কথা বলতেই হয় যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস গভীরভাবে সমাজ-সম্পৃক্ত। সামাজিক নানা বিষয় উপস্থাপনের বিষয়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌ সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছেন। বিশেষ করে এই বিষয়াদি সম্পন্ন হয়েছে পূর্ব-বাংলার সমাজ-কাঠামোয়, অন্য অঞ্চলে নয়। ওয়ালীউল্লাহ্‌ এই সমাজ উপস্থাপন করতে গিয়ে পূর্ব-বাংলার ধর্ম-চৈতন্যের গভীর ইতিহাস, নৃতাত্ত্বিক বিবরণ, ভৌগোলিক বিবরণের মাধ্যমে জনমমানসে ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত নানা প্রভাব স্পষ্ট করেছেন। আধুনিক সাহিত্যে বিমানবিকীকরণ প্রক্রিয়ায় "আধুনিক লেখক সম্প্রদায় নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছেন শিল্পকলায় মানবিক উপাদানের অনুপ্রবেশ।" (হুমায়ুন আজাদ, ২০০৫ : ২০) স্পেনদেশীয় দার্শনিক ও নন্দনতাত্ত্বিক হোসে অর্তেগা ঈ গাসেৎ (José Ortega Y Gasset, 1883-1955) আধুনিক শিল্প সম্পর্কে যে মতামত দেন, তার দেশনা যেমন জনজীবনের সাথে সম্পর্কহীন; তেমনি "আধুনিক শিল্পকলা যে আপামর সাধারণ উপভোগ করতে পারে না এতে বোঝা যায় যে এর প্রেরণাপুঞ্জ সর্বজনীনভাবে মানবিক নয়।" (হুমায়ুন আজাদ, ২০০৫ : ১৩)

কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ্‌ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্নতা এনেছেন তাঁর উপন্যাসে। প্রকরণ হিসেবে আধুনিক হলেও ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে গভীরভাবে মানবিকীকরণ প্রক্রিয়াই অনুসরিত হয়েছে। গাসেৎ-অবলম্বিত বিমানবিকীকরণ প্রক্রিয়া 'আধুনিক' সাহিত্যের বিষয় হওয়া সত্ত্বেও তা সক্রিয় থাকেনি ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে। গভীরভাবে জনজীবন-সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে *লালসালু* উপন্যাস এবং উপন্যাসের বিষয়বস্তু। ওয়ালীউল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী আন মারি ওয়ালীউল্লাহ্‌ (Anne Marie Waliullah, 1929-1997) রচিত *আমার স্বামী ওয়ালী* গ্রন্থের বর্ণনাও এই সত্য উপস্থাপন করে যে, ওয়ালীউল্লাহ্‌ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য নিয়ে গভীরভাবে ভাবতেন। এবং ব্যক্তিজীবনের নৈঃসঙ্গতা আর উন্মূলতা সত্ত্বেও গভীরভাবে চিন্তা-

ভাবনা করতেন নিজের জন্মভূমি সম্পর্কে। (আন মারি, ২০১২ : ১৩-১৮) আর তাঁর উপন্যাসে এসবেরই উপস্থাপনে প্রয়াসী থেকেছেন সবসময়; *লালসালুর* ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

তাই বলতে হয় ওয়ালীউল্লাহ্‌র, "যাবতীয় রচনাকে দুটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করা চলে বলে আমার ধারণা : এক দিকে তিনি বাস্তব জগৎসংসারের অভিজ্ঞতা ছেনে তৈরি করেন দুনিয়ার প্রত্যক্ষ বাস্তবতা ও তার অন্তরালে ক্রিয়াশীল জীবনসত্যকে; অন্য দিকে তিনি ঐ অভিজ্ঞতার সারাৎসার বুনে দেন অস্বচ্ছ এক মায়াবী জগতের মাটিতে যেখানে কুসুম ফুটে ওঠে প্রতীকে ও ব্যঞ্জনায়।" (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ভূমিকাংশ : ২০১৭) আদতে এটাই সত্য, ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্য-পাঠের বেলায়। আর এক্ষেত্রে প্রথমাংশ– 'দুনিয়ার প্রত্যক্ষ বাস্তবতা ও তার অন্তরালে ক্রিয়াশীল জীবনসত্যকে'– উপস্থাপন করেছেন *লালসালুতে*। কিন্তু তা কেবল পির-সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি ওয়ালীউল্লাহ্‌। একইসাথে তৎকালীন পূর্ব-বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রত্যক্ষ বিষয়-আশয়ের সাথে এই উপন্যাস সম্পৃক্ত থেকেছে। ফলে কেবলই যে 'পির-সমাজের ভণ্ডামি' আর 'মজিদ চরিত্রের বিকাশ-প্রক্রিয়া'-ই কেবল আলোচিত বিষয় নয়, এই উপন্যাসে– এরই সাথে সাথে আরও নানান বিষয় : রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মীয় চৈতন্য, ধর্ম ও ক্ষমতাকাঠামো, সাংস্কৃতিক দূরত্ব, কেন্দ্র-প্রান্ত সম্পর্ক, ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত অনুষঙ্গ, নারীমুক্তি-প্রয়াস, পূর্ব-বাংলার মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসসহ নানান বিষয় সক্রিয় থেকেছে এই উপন্যাসে।

টীকা

১. ইউটোপিয়া (Utopia) একটি গ্রিক শব্দ– যার অর্থ কোথাও নেই (Nowhere)। ইউটোপিয়ান রাষ্ট্র কেবল কল্পনায়-ই সত্য। বাস্তবে এমন রাষ্ট্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন টমাস মোর (Thomas More, 1478-1535)। টমাস মোর ১৫১৫ সালে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন; এবং প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন ১৫১৬ সালে। তৎকালীন ইংল্যান্ডের নানা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তার নিন্দা-জ্ঞাপন করেছেন প্রথম খণ্ডে। দ্বিতীয় খণ্ডে এক কাল্পনিক দ্বীপের কথা বলেছেন, যেখানে সবদিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ-ব্যবস্থা বিদ্যমান। এই বিষয়ের জন্য দ্রষ্টব্য : টমাস মোর (১৯৮১)। *ইউটোপিয়া* [*Utopia*-এর অনুবাদ], (প্রথম সংস্করণ)। অনুবাদ : মোহাম্মদ দরবেশ আলী খান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ৭-২০

২. 'ব্যবসায়ী ইংরেজ সরকার' বলতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকেই (East India Company) বোঝানো হচ্ছে। সিপাহি বিদ্রোহের (The Sepoy Mutiny, 1857) আগ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (East India Company) ভারত শাসন করেছে। যা ইতিহাসে 'কোম্পানি আমল' (১৭৫৭-১৮৫৭) হিসেবে পরিচিত। সিপাহি বিদ্রোহের পরপরই কোম্পানি এই নিয়ন্ত্রণ হারায়; নিয়ন্ত্রিত এই শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। ভারতের শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ করেন মহারানি ভিক্টোরিয়া। এ বিষয়ের জন্য দ্রষ্টব্য : Shashi Tharoor (2016). *An Era of Darkness : The British Empire in India*. Aleph Book Company, New Delhi. p. (xiii-xv)

৩. জব চার্নক (Job Charnock, 1630-1692/93)-এর মৃত্যু-সাল নিয়ে দ্বিমত আছে। বাংলাদেশের জাতীয় কোষগ্রন্থ *বাংলাপিডিয়ার* ভুক্তি-তথ্যানুসারে জব চার্নকের মৃত্যু-সাল ১৬৯২। কিন্তু এনসাইক্লোপিডিয়া *ব্রিটানিকা* অনুসারে জব চার্নকের মৃত্যু-সাল ১৬৯৩। এ বিষয়ের জন্য দ্রষ্টব্য : ১. Retrieved from : https://www.britannica.com/biography/Job-Charnock. ২. সিরাজুল ইসলাম [সম্পা.] (২০১২)। ভুক্তি : "চার্নক, জব", *বাংলাপিডিয়া (চতুর্থ খণ্ড)*। এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

৪. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯৩৯ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন ১৯৪১ সালে। বিএ পাস করেন ১৯৪৩ সালে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কর্মজীবনে তিনি ইংরেজি দৈনিক *স্টেটসম্যান*-এ চাকরি করেছেন। ফলে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং ইংরেজি ভাষাজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন করা অবান্তর। তাঁর ইংরেজি জ্ঞান সম্পর্কে আরও স্পষ্ট হওয়া যায় *কদর্য এশীয়* (*The Ugly Asian*), *শিম কীভাবে রান্না করতে হয়* (*How Does One Cook Beans*) উপন্যাস-পাঠের পর। এই বিষয়ের জন্য দ্রষ্টব্য : ১. মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন (১৯৯০)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক*। মুক্তধারা, ঢাকা। পৃ. ১৯-৩১ ২. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (২০১৮)। সাজ্জাদ শরিফ লিখিত 'ভূমিকাংশ', *কদর্য এশীয়* [*The Ugly Asian*-এর অনুবাদ]। অনুবাদ : শিবব্রত বর্মন, অবসর, ঢাকা।

সহায়কপঞ্জি

আকবর আলি খান (২০১৯)। *বাংলায় ইসলাম প্রচারের সাফল্য : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

আন মারি ওয়ালীউল্লাহ্ (২০১২)। *আমার স্বামী ওয়ালী* [*Wali, My Musband, as I Saw Him*-এর অনুবাদ]। অনুবাদ : শিবব্রত বর্মন, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

আনিসুজ্জামান (২০১৪)। *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য*। চারুলিপি, ঢাকা।

আবদুল বাছির (২০১২)। *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আশরাফ সিদ্দিকী (২০১০)। *কিংবদন্তীর বাংলা*। সালমা বুক ডিপো, ঢাকা।

উইলিয়াম ডব্লিউ হান্টার (২০১৮)। *পল্লীবাংলার ইতিহাস* [*The Annals of Rural Bengal*-এর অনুবাদ]। অনুবাদ : ওসমান গনি, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

জেমস ওয়াইজ (২০০০)। *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ* [*Notes on thd Races, Castes and Trades of Eastern Bengal*-এর অনুবাদ]। অনুবাদ : ফওজুল করিম (সম্পা. মুনতাসীর মামুন), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

তীর্থংকর রায় (২০১৭)। *ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

দীপ্তি ত্রিপাঠী (১৯৯৭)। *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। 'বাংলাদেশের পাঁচটি নাটক : প্রসঙ্গ গঠনশৈলী', *বাংলাদেশের সাহিত্য*। আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান (২০০৯)। *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ (১৯৪৭-১৯৮৭)*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

শাহীদা আখতার (১৯৯২)। *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস (১৯৪৭-১৯৭১)*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সরদার ফজলুল করিম (২০১৬)। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ : অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক-এর আলাপচারিতা*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

সৈয়দ আকরম হোসেন (২০২০)। *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (২০১২)। *উপন্যাসসমগ্র*। সম্পাদক : হায়াৎ মামুদ, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (২০১৭)। *গল্পসমগ্র*। সম্পাদক : হায়াৎ মামুদ, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (২০১৮)। *কদর্য এশীয়*। অনুবাদ : শিবব্রত বর্মন, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

সোহানুজ্জামান (২০১৬)। 'অ্যাবসার্ড নাটক : বাইরে, ঘরে'। *দ্বীপজ* (ঈদ সংখ্যা), [সম্পা. সাব্বির আলম চৌধুরী], ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (২০০৫)। 'শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ', *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (২০০৫)। 'ভাষা-আন্দোলন-পূর্ব (১৯৪৭-১৯৫২) বাঙলাদেশের সাহিত্যে বিধৃত সমাজের রূপ : বাঙালির স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ', *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

হুমায়ুন কবির (২০১৫)। *বাঙলার কাব্য* [আনিসুজ্জামান সম্পাদিত]। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

Karen Armstrong (1993). *A History of God : From Abraham to the Present : The 4000-year Quest for God*. Vintage Books, London.

T. Macaulay, Babington (2nd February, 1835). 'Minute on Indian Education'. Retrieved from : http://home.iitk.ac.in/~hcverma/Article/Macaulay-Minutes.pdf.

Sarah Elizabeth Titcomb (1889). *Aryan Sun-Myths : The Origin of Religions*. Nims and Knight Publication, New York.